সংবাদ

012

তারিখ 18 NOV 1985
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম—শেষ পর্ব

শিশু শিক্ষা পাঠ্যক্রম ঢেলে সাজানোর চেষ্টা চলছে

।। শওকত মাহমুদ ।।

'আমরা করজ করি। কেন করজ করি? চাষ করিতে করজ (কর্জ) করি। করজ কি করিয়া ফিরত দিব? ধান বেচিয়া করজ ফিরত দিব। ধান বেচিয়া কি খাইব? আবার করজ করিয়া খাইব।'

কথাগুলো 'ব্যবহারিক লেখা পড়া (প্রথম অংশ)' শীর্ষক একটি পাঠ্য বইয়ের। গণশিক্ষা কর্মসূচীতে বইটি নাগতার সুরে পড়ানো হয়। এর রচয়িতা জেমস জেনিংস ও আনসার হাবীবুর রহমান। সম্পাদনায় দীপ্তি রোজারিও। মুদ্রণে খ্র্যাক প্রিন্টার্স। বইটির সুবিধা হলো, একই সাথে এটি খাতা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অসুবিধে হল চাচীরা শিখছে কি? তাদেরকে শেখানো হচ্ছে, কর্জের চক্রেই আজীবন ঘুরপাক খেতে হবে। অথচ গণশিক্ষার উদ্দেশ্য হলো সচেতনতা বাড়ানো, স্বনির্ভর করা এবং এ শিক্ষাকে বাস্তবে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

রায়পুর উপজেলা থেকে ফেরার পথে মহাদেবপুরে দুটি শিশু গণশিক্ষা কেন্দ্রে গিয়েছিলাম। সেখানে আরেক প্রস্থ চমক অপেক্ষা করছিল। তা হলো, শিশুদের পাঠ্য বর্ণমালা বই। এটি মসজিদ মিশনের। প্রতিটি বর্ণমালার পাশে উল্লেখিত ছড়াগুলো ধর্মীয় প্রচারণাপূর্ণ। সাধারণ

(৩-এর পাতায় দেখুন)

নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম

(১ম পাতার পর)

বর্ণমালা বইয়ে যেমন 'অ' তে আছে 'অজগর আসছে ধেয়ে'। এ বইটিতে 'হ' অক্ষরের পাশে আছে 'হরফ শেখো, কেতাব পড়।' আরবী শব্দের ছড়াছড়ি। এগুলো শিশুরা সুর করে পড়ছে। গণশিক্ষা কর্মসূচীর ব্যবস্থাপক জনাব মো: হানিফকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি খানিকটা বিচলিত হাসি হাসলেন-- বইগুলো বিনামূল্যে পাওয়া গিয়েছিল।

মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে প্রবর্তিত গণশিক্ষা কার্যক্রম হালে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু নোয়াখালীতে কেন অব্যাহত রয়েছে--এ প্রশ্নের জবাবে জনাব হানিফ বললেন, শিক্ষার উপকরণ প্রচুর বয়ে গিয়েছে, তাই সেগুলো দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। লক্ষ্মীপুরে গণশিক্ষা কর্মসূচীর প্রশিক্ষক জনাব আউয়াল জানিয়েছেন, শিশু শিক্ষার পাঠ্যক্রম নতুন করে ঢেলে সাজানোর কাজ চলছে উচ্চ পর্যায়ে।

মহাদেবপুরে আলাপ হল শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকা শামিম আখতার ও মিনু রানী সাহার সাথে। মিসেস আখতার তিন বছর যাবৎ পড়াচ্ছেন। এমনিতে গৃহিনী, বিকেলে ক্লাস হয়। ২৭৫ টাকা সম্মানী পান। এ কাজে তার ভীষণ আনন্দ। যেসব শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে পারেনা তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে আনা হয় অথবা অভিভাবকেরা দিয়ে যান। ৫০ জন ছাত্র তিনটি গ্রুপে বিভক্ত। প্রত্যেক গ্রুপের নেতা আছে। ক্লাস শুরুর আগে নেতারা বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে সদস্যদের ডেকে স্কুলে নিয়ে আসে। মিনু রাণী সাহার স্বামীর পানের দোকান আছে লালবাজারে।

শওকালীন শিক্ষকতার কাজ তারও পছন্দ। তার এক ছাত্রী মনোয়ারার সাথে কথা হল। গরীব ঘরের মেয়ে। দিনে সংসারের কাজ করে। তার নাম লিখতে বলা হলে ঠিকমত লিখতে পারল না। আমি লিখে দিলে ও বলল 'ভুলি গেছি'।

এসব কেন্দ্র থেকে অনেকে প্রাথমিক স্কুলে যায়। লক্ষীপুর জেলা গণশিক্ষা কর্মসূচীর বার্ষিক রিপোর্ট (১৯৮৪-৮৫) অনুযায়ী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসব কেন্দ্রের ১২ দশমিক ৪৩ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী গেছে। অন্যদিকে দলছুটদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ২৮ ভাগ। সার্বিকভাবে গণশিক্ষা কর্মীদের নিষ্ঠাবান, উৎসাহী মনে হয়েছে। বৃহত্তর নোয়াখালী এলাকায় ৯১২টি শিশু, ৩৩টি পুরুষ ও ৩৩টি মহিলা কেন্দ্র রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আছে ৩৯ হাজার ৫৩৯টি শিশু, ৬৬৯ জন পুরুষ, ৬৬৫ জন মহিলা। বয়স্ক-

১৯৮৪ সালে যেখানে ৮৫টি পুরুষ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল, '৮৫তে কেন্দ্রের সংখ্যা ৬৫তে নেমে আসে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ (১৯৮৩-৮৪) অনুযায়ী, ১৯-৭৪-এ বৃহত্তর নোয়াখালীতে শিক্ষিতের হার ছিল ২৬ দশমিক ৭ ভাগ। '৮১তে ২৬ দশমিক ৫ ভাগ। '৭৪-এ শিক্ষিতের মানদণ্ড স্বয় লিখতে ও পড়তে পারা। '৮১-র শুমারিতে মানদণ্ড ছিল, যে-ই শিক্ষিত, যে একটা চিঠি লিখতে পারে।